সভ্যতা
সংকট
দিগদর্শন
আহমদ আবদুল কাদের

সভ্যতা সংকট দিগদর্শন

ড. আহমদ আবদুল কাদের

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস

২/২, পুরানা পল্টন (আজিজ অটো, ৫ম তলা), ঢাকা-১০০০।

মোবাইল: ০১৭১১-৩১৮৩২৭

সভ্যতা সংকট দিগদর্শন

১ম সংস্করণ ও প্রকাশ
রবিউল আউয়াল-১৪৪৭
ভাদ্র-১৪৩২
সেপ্টেম্বর-২০২৫

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস
২/২, পুরানা পল্টন (আজিজ অটো, ৫ম তলা), ঢাকা-১০০০।
মোবাইল: ০১৭১১-৩১৮৩২৭
website: www.chhatra-majlis.org.bd

মূল্য: ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

Sovvota Songkot Digdorshon (Civilization Crisis Perspective)
Published by Bangladesh Islami Chhatra Majlis
Central Office: 2/2, Ajij Autous (5th floor), Dhaka-1000
Phone: 01711-318327, Price: TK. 40.00 Only

সভ্যতা সংকট দিগদর্শন

বর্তমান বিশ্ব এক ভয়াবহ সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা স্থবির হয়ে পড়েছে। মানবজাতির জন্য এ সভ্যতা এক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে কমিউনিজমের চরম ব্যর্থতা ও পতন আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার অন্তনিহিত সারশূন্যতাকেই প্রকট করে তুলেছে। প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তি নির্ভর এ সভ্যতা বহু পূর্বেই তার মানবিক উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। কমিউনিজমের পতন তাকে তরান্বিত করেছে মাত্র। পুঁজিবাদী দুনিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্র, মুক্ত অর্থনীতির নামে সীমাহীন বৈষম্য ও একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী অবাধ শোষণ প্রক্রিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অর্থনৈতিক সাম্যের গালভরা বুলি, শোষণ বন্ধের নামে কারাগারধর্মী শাসন ব্যবস্থা সবই আজ মানবজাতির সার্বিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ। কমিউনিজমের সাম্প্রতিক পতন এবং পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লেজুড়ে পরিণত হওয়া সামগ্রিক ব্যর্থতা ও হতাশারই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

মানবজাতি বিশেষ করে শোষিত-বঞ্চিত মানুষ আজ হতচকিত, হতাশ। তাদের সামনে বিরাজ করছে শূন্যতা। পুঁজিবাদ কার্যত বহু পূর্বেই ব্যর্থ হয়েছে। সমাজতন্ত্রও আজ ব্যর্থ চরমভাবে। এখন মানবতা যাবে কোন দিকে? মানবতার বিকল্প পথ কি? সন্দেহ নেই বিকল্প অনিবার্য। বর্তমান স্থবির সামরিক শক্তি নির্ভর ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্রের ফাকা আওয়াজ দীর্ঘদিন চলবে না, চলতে পারে না। চলতে পারে না গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয়া মার্কিন মোড়লীপনা, একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদ ও মোড়লীপনার তথাকথিত "নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা"। তাই দিন এসেছে বিকল্প অনুসন্ধানের। বস্তুতঃ বর্তমান পুস্তিকায় আজকের বিশ্বের আদর্শিক সংকটের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.)-এর আদর্শের উপযোগিতা বিশ্লেষণ, করে সংকট সমাধানে ইসলামের ভূমিকার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

আধুনিক জড়বাদী পশ্চিমা সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার উন্মেষ ঘটে মুসলিম শক্তির পতনের পটভূমিতে। এগারো শতকের শেষার্ধে মুসলিম শক্তির সঙ্গে ইউরোপীয় শক্তির ক্রুসেড সংঘটিত হয়। ক্রুসেডের সূত্র ধরে মুসলিম সভ্যতা ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয় মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপ। ফলে ইউরোপে জাগরণ শুরু হয়। দ্বাদশ শতকে মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে ইতালিতে নাগরিক সভ্যতার সূচনা হয়। একদিকে মুসলিম শক্তি পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল অন্যদিকে প্রথমে ইতালি ও পার্শ্ববর্তী সময়ে সমগ্র ইউরোপে জাগরণ আসতে শুরু করে। একটির পতন আর একটির উন্মেষ।

ইউরোপীয় রেঁনেসা

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতাকে ইউরোপীয় রেঁনেসার ফল বলা হয়। আবার ইউরোপীয় রেঁনেসা মূলতঃ প্রাচীন গ্রীক রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতি-আদর্শের নব জাগরণ, নতুন রূপ। ১৪ শতকের কবি পণ্ডিত পেত্রাকের মতে রোমীয় যুগ থেকে পরবর্তী এক হাজার বছর পর্যন্ত ইউরোপের জন্য অন্ধকার যুগ। তাই তিনি পুরনো রোমীয় ঐতিহ্যকে উদ্ভাসিত করে বিস্মৃতিকে দুর করার শ্লোগান তুলেন। তিনি উদাত্ত আহবান জানান যে, ইউরোপকে অতীতের অর্থাৎ গ্রীক-রোমান আলোকবর্তিকায় সামনের দিকে এগুতে হবে। রোমান-গ্রীক চিন্তা ও আদর্শই হবে পথ নির্দেশক। ১৪ ও ১৫ শতকের মানবতাবাদী চিন্তানায়কগণ প্রচার করতে থাকেন যে, পাশ্চাত্যের উন্নতি নির্ভর করছে অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞান পুর্নজাগরণের উপর। মিসলেটের মতে রেঁনেসা হচ্ছে মধ্যযুগের নিরঙ্কুশ বিপরীত ধারা। বস্তুতঃ ১২ ও ১৩ শতকে রোমান আইনের পুনঃপ্রবর্তন, ধ্রুপদী কাব্যের বিকাশ, গ্রীক বিজ্ঞান, ভাষা ও ছন্দের জাগরণ ইউরোপীয় রেঁনেসার গতি সঞ্চার করে। রোম-গ্রীক ধাঁচের ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণা, জড়বাদী চিন্তা ও দর্শন, জাতীয়তাবাদের বিকাশ, নৈতিকতার কবল থেকে রাজনীতিকে পৃথক করা ইত্যাদি সব মিলিয়ে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ তরান্বিত হয়। ১৯ শতকে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি আধুনিক সভ্যতাকে পূর্ণতা দান করে এবং তার সমৃদ্ধিকে অপ্রতিহত করে তুলে। মোটকথা পশ্চিমা সভ্যতা পুরনো গ্রীক-রোমান সভ্যতারই পুর্নজাগরণ। গ্রীক-রোমান দর্শন ও সংস্কৃতির মৌল কাঠামোর উপরই আধুনিক সভ্যতার উপরি কাঠামো নির্মিত হয়েছে।

জড়বাদী সভ্যতা

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা একটি জড়বাদী সভ্যতা। কারণ এ সভ্যতার মূলে অনেকগুলো উপাদান থাকলেও এর সারনির্যাস হচ্ছে জড়বাদ। জড়বাদীদের মতে জড় বা বস্তুই হচ্ছে বিশ্বের আদিম অস্তিত্ব। জড়ই হচ্ছে চরম এবং পরম। জড়ের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান জগত ও জীবনের আবির্ভাব। তাই জগত ও জীবন বিশ্লেষণে কোন অতি প্রাকৃতিক সত্ত্বার অস্তিত্ব মেনে নেয়া ও কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই মানুষের চলার পথের একমাত্র দিক নিদের্শক। কোন ঐশী পথ নির্দেশ এক্ষেত্রে অবান্তর ও অসম্ভব। বস্তুগত উন্নতি ও বৈষয়িক উপযোগিতাই হচ্ছে সভ্যতার চালিকা শক্তি। সভ্যতার মৌলিক উদ্দেশ্যও তাই। সমাজের বিকাশও এ প্রয়োজনেই। ভিন্ন কোন মহত্তর লক্ষ্যাভিমুখী গতি মানব সমাজ ও সভ্যতায় নেই। সমাজ ও প্রগতি মানে বস্তুগত ও তদসংশ্লিষ্ট অগ্রগতি। এ দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনই হচ্ছে জড়বাদের মূলকথা। বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতার মূল নির্যাসও এটাই। যদিও বিস্তারিত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বর্তমান সভ্যতা বিনির্মাণের পিছনে বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও কার্যকারণ সক্রিয় ছিলো, তবুও এ সভ্যতার

উন্মেষ, গঠন ও বিকাশ প্রতিটি পর্যায়ে জড়বাদই প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। তাই এ সভ্যতার মূল চরিত্র হচ্ছে জড়বাদী-বস্তুবাদী।

বর্তমান সভ্যতার উন্মেষ পর্বে বিজ্ঞান সাধনা ও চার্চের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রবল দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বে বিজ্ঞান ও চার্চ পরস্পর বিপরীত অবস্থান নেয়। খৃষ্টীয় ধর্মীয় শ্রেণীর গোড়ামী, অন্ধত্ব ও প্রতিক্রিয়াশীলতা বিজ্ঞান সাধনার ধারকদের শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মবাদ তথা ধর্মবোধের বিপরীত দিকে ঠেলে দেয়। তদানীন্তন বুদ্ধিজীবি ও বিজ্ঞান সাধকদের জড়বাদের দিকে ঝুকে পড়া কোন বিজ্ঞান সাধনার ফল নয় বরং বিজ্ঞান ও চার্চের দ্বন্ধ থেকে উদ্ভুত এক ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। মোটকথা যেভাবেই হোক না কেন বর্তমান সভ্যতা আগাগোড়া জড়বাদী সভ্যতায় পরিণত হয়েছে।

বর্তমান সভ্যতার প্রধান দুটি স্তর

কোন সভ্যতাই নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলে না। অনেক চড়াই-উৎরাই ও পর্যায় অতিক্রম করে একটি সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। বর্তমান পশ্চিমা জড়বাদী সভ্যতার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ সভ্যতাও কতিপয় পর্যায় বা স্তর অতিক্রম করে বর্তমান স্তরে উপনীত হয়েছে। তন্মধ্যে দুটি স্তর প্রধান– ১. পুজিবাদী স্তর, ২. সমাজতান্ত্রিক স্তর।

পুঁজিবাদী স্তর

বর্তমান জড়বাদী সভ্যতার মূখ্য স্তর হচ্ছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ প্রথম দিকে একটি অর্থনৈতিক ভাবধারা ও পদ্ধতি হিসেবে বিকাশ লাভ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে জড়বাদী দর্শন, সেক্যুলার ও নৈতিকতা বিবর্জিত রাজনীতি, ভোগবাদী চেতনা, উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, প্রযুক্তির উন্নয়ন, নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপন ইত্যাদির ভিত্তিতে পুঁজিবাদের বিকাশ দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ হয়।

পুঁজিবাদ বিকাশের শতাব্দীকালের মধ্যেই কিন্তু তার মানবতা বিরোধী ভূমিকা স্পষ্ট হতে শুরু করে, তার অভ্যন্তরীণ বৈপরিত্ব ও গোঁজামিল প্রকাশ হতে থাকে। জড়বাদী সভ্যতার পুঁজিবাদী স্তরে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও অবমাননার সীমা থাকে না। এক দিকে মাত্র গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতে সম্পদ স্তূপীকৃত হওয়া এবং অন্য দিকে অধিকাংশ মানুষের মানবেতর জীবনযাপন পুঁজিবাদের অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

আর্ত-মানবতার হাহাকারে সভ্যতার গোটা অবয়বটাই কেপে উঠে। এ অবস্থা থেকে মানবতাকে রক্ষা করা এবং পুঁজিবাদ ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথেই যাতে জড়বাদী সভ্যতাটি ধ্বংস না হয় তার জন্য বিকল্প ভাবনা শুরু হয়। আর এ প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ।

সমাজতান্ত্রিক স্তর

মূলত পুঁজিবাদের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিকল্পে তাত্ত্বিক হাতিয়ার রূপে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের জন্ম। সমাজতন্ত্র ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্বাভাবিক কোন পর্যায় নয়

(মার্কসবাদীরা যেমন মনে করে থাকেন) এ হচ্ছে পতনমুখ জড়বাদী সভ্যতাকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য রচনা করা একটি তত্ত্ব মাত্র। কমিউনিজম বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ পৃথিবীতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। দুনিয়ার নিপীড়িত-মজলুম-মুস্তাদআফীন মানুষ বিপুলভাবে সাড়া দেয়। নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নে উদীপ্ত হয় তরুণ সম্প্রদায়। শ্রমিক শ্রেণী এগিয়ে আসে নতুন বিপ্লবের আহবানে। এ শতকের গোড়ার দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নৈরাজ্য ও অব্যবস্থার সুযোগে চীনসহ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের প্রয়াস চলে কমিউনিষ্ট শাসিত দেশগুলোতে। দাবী করা হয় সফলতার পথ ধরে তারা এগিয়ে চলছে। শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন, সরকারহীন, অভাবহীন ও বৈষম্যহীন সমাজ কায়েমই ছিলো কমিউনিজমের চূড়ান্ত লক্ষ্য। বিগত সাত দশক ধরে দাবী করা হচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সে দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা গেল এসব দাবী ভুয়া, ফাঁকা। জেগে উঠলো সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাধারণ মানুষ, অভ্যুত্থান ঘটলো জনতার। ভেঙ্গে গেল সমাজতন্ত্রের দুর্বল প্রাসাদ। প্রত্যাখ্যাত হলো কমিউনিজম। ব্যর্থতা, হতাশা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া আশ্রয় নিচ্ছে আজ পুঁজিবাদে। কমিউনিজমের এ পতন করুণ; যদিও তা ছিলো অনিবার্য। পুরো ব্যবস্থাটা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো জনগণের উপর। পার্টি একনায়কত্ব, আমলাতন্ত্র, গোয়েন্দা সংস্থা, পার্টি নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী আর অমানবিক দমন নীতির উপরই কার্যতঃ দাড়িয়েছিলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। শেষ কুল রক্ষা হলো না, অনিবার্য পতনের দিকে এগিয়ে যেতে হলো।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মৌল পার্থক্য নেই

আপাত দৃষ্টিতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র পরস্পরে বিকল্প হলেও উভয়ের মধ্যে মৌলিক কোন তফাৎ নেই। দর্শন বিচারে উভয়েই এক। উভয়ের ভিত্তি বস্তুবাদ। পুঁজিবাদের ভিত্তি স্থুল ও যান্ত্রিক বস্তুবাদ। সমাজতন্ত্রের ভিত্তি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।

বস্তুবাদী সভ্যতাকে আরো গতিশীল ও স্থায়ী করার লক্ষ্যে বস্তুবাদের স্থুল ও যান্ত্রিক ধারণা পরিহার করে বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা দেয়ার ভিত্তিতেই গড়ে তোলা হয়েছে সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদ চায় বস্তুগত উন্নতি। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যও তাই। পুঁজিবাদ অবাধ অর্থ ব্যবস্থা ও রাজনীতির মাধ্যমে তা সম্ভব মনে করে। সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র-সামাজিক নিয়ন্ত্রণে তা বেশী কার্যকর বলে মনে করে। ধর্মের প্রশ্নেও উভয়ে কাছাকাছি। পুঁজিবাদ রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি থেকে ধর্মকে পৃথক রাখতে বদ্ধ পরিকর। সমাজতন্ত্র রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি থেকে তো বটেই ব্যক্তির মন-মগজ থেকেও ধর্মকে উৎখাত করতে চায়। পুঁজিবাদ ধর্মকে কোণঠাসা আর সমাজতন্ত্র যতদূর সম্ভব উৎখাত করতে চায়। উভয়ের চরিত্র সাম্রাজ্যবাদী। উভয়ের নৈতিক দৃষ্টিকোণের ভিন্নতা অতি সামান্য। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদেরই রাষ্ট্রীয় রূপ। কাজেই বলা যায় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্য রূপগত- সারগত নয়। পার্থক্য দর্শনগত নয় কর্মসূচী গত। মূলত সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের সম্পূরক স্তর। এ হচ্ছে বস্তুবাদের মূখ্য স্তর পুঁজিবাদেরই অনুষঙ্গী গৌণ স্তর। এজন্যই সমাজতন্ত্রের কর্মসূচীগত ব্যর্থতা তাকে পুঁজিবাদের দিকে নিয়ে গেছে। পুঁজিবাদই হয়েছে তার আশ্রয়। কেননা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র বস্তুবাদী সভ্যতারই অঙ্গ। এক অঙ্গের পরিপূরক অন্য অঙ্গ। তাই সমাজতন্ত্রের পুঁজিবাদের দিকে ঝুকে পড়ায়

বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের পতনও ছিলো অনিবার্য। মুখে পুঁজিবাদের বিকল্প অথচ পুঁজিবাদ যে সভ্যতার মূখ্য স্তর সে সভ্যতার কাঠামোর ভিতরে তার অবস্থান। গৌণ স্তর প্রতিযোগিতায় মূখ্য স্তরের সঙ্গে পারার কথা নয়, পারেওনি। কাজেই যা হওয়ার তাই হয়েছে। মূখ্য স্তরে গৌণ স্তর আত্মস্থ হয়েছে। ঘটেছে সমাজতন্ত্র কমিউনিজমের পতন।

পুঁজিবাদের ব্যর্থতা, কমিউনিজমের পতন বস্তুবাদী সভ্যতারই সামগ্রিক ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ; এর দেওলিয়াত্ব, আদর্শ শূন্যতা ও স্থবিরতার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। তবু এখনও পুঁজিবাদের মেদবহুল দেহটি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কিভাবে? সামরিকশক্তি, অর্থনৈতিক প্রাধান্য আর পেশী শক্তির বলে। এইড রাজনীতি, ষড়যন্ত্র, অস্ত্র, ভীতি সঞ্চার আর গণতন্ত্রের ফাঁকা বুলি এ সবই পশ্চিমা সভ্যতার বর্তমান অবস্থা। কিন্তু এভাবে কোন সভ্যতাই দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। পুঁজিবাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। পুঁজিবাদের রূপ পাল্টিয়ে, কমিউনিজমকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে পেশী শক্তি দিয়ে পুঁজিবাদ দীর্ঘদিন মানবতাকে লুণ্ঠন, দমন আর শোষণ করতে পারবে না। সময় এসেছে বস্তুবাদের বিকল্প ভাবনার। তবে বস্তুবাদের কাঠামোর ভিতরে নয়, এর বাইরে। শুধু পুঁজিবাদের নয়- গোটা সভ্যতার বিকল্প প্রয়োজন। আজকের সংকট শুধু পুঁজিবাদের নয়, শুধু সমাজতন্ত্রের নয়- এ হচ্ছে বস্তুবাদী সভ্যতার সংকট।

বর্তমান সভ্যতার সৃষ্ট সংকট

বর্তমান সভ্যতা মানবজাতির জন্য গভীর সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করেছে। এ সমস্ত সংকট মানবজাতির অগ্রগতি, সংহতি ও ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। এ সমস্ত সংকট অসংখ্য। তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলো বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার:

১. *সামাজিক অবক্ষয়:* পশ্চিমা সভ্যতার অন্যতম কুফল হচ্ছে সামাজিক অবক্ষয়। সামাজিক বিশৃঙ্খলতা ও দ্বন্দ্ব এ সভ্যতার অঙ্গ। সামাজিক সংহতি, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, পরিবার সংরক্ষণ, পিতা-মাতা-সন্তানাদির পরস্পর সম্পর্ক, বিয়ে ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমান সভ্যতা পশ্চিমা সমাজ অবক্ষয়ের সৃষ্টি করেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক অস্থিরতা, সমাজ বিছিন্নতা, নৈরাজ্য, উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধ। বেড়েছে হাজারো রকমের অপরাধ। কিশোর অপরাধ আজ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, শিশু নির্যাতন, শিশু ধর্ষণ, আত্মহত্যা, মানসিক বৈকল্য, মাদকাসক্তি ইত্যাদি আজ নিত্য-নৈমিত্তিক। সামাজিক, নৈতিক অবক্ষয়রোধে জড়বাদী সভ্যতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ সবকিছুই এ সভ্যতার অর্ন্তনিহিত ত্রুটি ও পতনেরই লক্ষণ।

২. *নৈতিক-আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা:* জড়বাদী সভ্যতা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনকে কার্যত অস্বীকার করে বসেছে। এ মানুষের ধর্মবোধ, স্রষ্টা চিন্তা, নৈতিক চেতনা সবকিছুকেই হয় অস্বীকার করেছে না হয় কোণঠাসা করে রেখেছে। পুঁজিবাদী প্রবণতা নৈতিক শিক্ষাকে যতটুকু পারে বিনষ্ট করার প্রয়াস চালাচ্ছে। তত্ত্বগতভাবে ধর্মকে পুরোপুরি অস্বীকার না করলেও ধর্মের বিকাশকে অত্যন্ত গৌণ করে দিয়েছে। অন্যদিকে কমিউনিজমতো আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মকে-ধর্মবোধকে উৎখাতের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। মানুষের মনোজগতে, আধ্যাত্মিক জগতে সৃষ্টি হয়েছে অভাববোধ ও তীব্র শুন্যতা, দেখা দিয়েছে নৈতিক-আধ্যাত্মিক বিশৃঙ্খলা। একজন ব্যক্তি মানুষের

বিকাশের গতি হয়েছে ব্যাহত। সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ গেছে থেমে। মানুষ হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক, মানবিকতার পরিবর্তে পশু সুলভ চরিত্র বিকাশ লাভ করেছে। গভীর মনস্তাত্বিক ও আধ্যাত্মিক শূন্যতার গহ্বরে জনগণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বিভিন্নভাবে ঘটেছে তার প্রকাশ। সমাজ বিমুখতা, সমাজ বিচ্ছিন্ন চিন্তা, রহস্যবাদী নানা বিভৎস কার্যক্রমের দিকে ঝুকে পড়া সবকিছুই মনোবৈকল্য ও আধ্যাত্মিক জীবনের অসুস্থতারই লক্ষণ। কাজেই এ সভ্যতা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের অসুস্থতারই লক্ষণ। কাজেই এ সভ্যতা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারেনি। শুধু জৈবিক ও যান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়। তার প্রমাণ বিগত কয়েক শ' বছরের জড়বাদী সভ্যতার ইতিহাস। আজ পশ্চিমা জগতে সৃষ্টি হয়েছে বহু গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষত, সৃষ্টি হয়েছে বিরাট শূন্যতা। ফলে জড়বাদী সভ্যতার পতন হচ্ছে তরান্বিত।

৩. অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিশ্বজোড়া দারিদ্র: জড়বাদী পশ্চিমা সভ্যতার বিরাট দাবী ছিলো যে, সে মানব সভ্যতার বৈষয়িক প্রয়োজন নিশ্চিতভাবেই পূরণ করবে। এটিই ছিলো তার প্রধানতম লক্ষ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার দাবীও সে যথাযথভাবে পূরণ করতে পারেনি। পুঁজিবাদী দুনিয়ার ধন-বৈষম্য, পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার ফলে বিশ্বজোড়া দারিদ্র মানব সভ্যতার ভবিষ্যতকে আতংকিত করে তুলেছে। দুনিয়ার বেশীর ভাগ সম্পদ আজ ব্যবহৃত হচ্ছে মারণাস্ত্র তৈরীতে, বিলাস উপকারণাদি উৎপাদনে। পৃথিবীর সম্পদরাজীর কল্যাণমুখী ব্যবহার হলে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মানবজাতি মুক্তি পেতে পারতো কিন্তু তা আজ সুদূর পরাহত। দারিদ্র সমস্যা সমাধানের চেয়ে দারিদ্র জিইয়ে রেখে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের ষড়যন্ত্র কার্যকর। দারিদ্র মোচনের শ্লোগান আছে, আছে সংলাপ, সাহায্য প্রকল্প ইত্যাদি অনেক কিছুই। কিন্তু দারিদ্র স্থায়ীভাবে দূরীকরণের কার্যত কোন উদ্যোগ নেই। এই পুঁজিবাদী সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একদিকে দেশের অভ্যন্তরে ধন-বৈষম্যকে প্রকট করে তোলা এবং আন্তর্জাতিকভাবে ধন-বৈষম্যকে জিইয়ে রাখা। বস্তুগত ব্যবধান সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এবং তার মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার পশ্চিমা পুঁজিবাদী সভ্যতার মূল নির্যাস। তাই পৃথিবীর এত সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতার যথেষ্ট বিকাশ সত্ত্বেও ধন-বৈষম্য ও বিশ্বজোড়া দারিদ্র দূরীকরণে এ সভ্যতা ব্যর্থ। এ সভ্যতা তার ঘোষিত প্রধান লক্ষ্যই অর্জনে সক্ষম হয়নি। ফলে এ সভ্যতার অস্তিত্বের মূল কারণটাই বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

৪. বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-সংঘাত-দ্বন্দ্ব: পৃথিবীতে এর আগেও যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এ সভ্যতার আবির্ভাবের ফলে এত ভয়াবহ পরিস্থিতি পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেনি। দু' দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলো। কোটি কোটি মানুষ নিহত হলো। তাছাড়া দুনিয়ার সর্বত্রই যুদ্ধ-সংঘাত লেগেই আছে। এ সব যুদ্ধ সুচতুরভাবে বাধানো ও টিকিয়ে রাখছে সভ্যতার মূল ধারক-বাহকরাই। যতদিন এ জড়বাদী পুঁজিবাদী সভ্যতা টিকে আছে ততদিন পর্যন্ত মানুষ ভয়াবহ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে নিরাপদ হতে পারে না। যুদ্ধ পুঁজিবাদী শোষণ ও লুণ্ঠনের জন্য অত্যাবশ্যক। তাই তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ও সুবিধামত যুদ্ধ বাঁধানোর, টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছে। যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অস্ত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে দুনিয়ার বিপুল সম্পদ ও মেধা। একদিকে মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণেরও ব্যবস্থা হচ্ছে না অন্যদিকে যুদ্ধ-সংঘাতে ব্যয় হচ্ছে অজস্র অর্থ-সম্পদ। এ সবই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার ফল।

৫. মানুষের সার্বিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা: মানুষের জীবনে রয়েছে হাজারো সমস্যা। আধ্যাত্মিক-নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈষয়িক সর্বত্র সমস্যা পরিব্যাপ্ত। তাছাড়া রয়েছে জাতিগত, বর্ণগত, অঞ্চলগত, শ্রেণীগত, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি সমস্যা। রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এবং নৈতিকতা ও বস্তুগত উৎকর্ষতার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং ভারসাম্য স্থাপন সমস্যা। একটি সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ সমাজ সভ্যতা ও আদর্শের কাজ এসব সমস্যা সংকটের সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বর্তমান জড়বাদী সমাজ ও আদর্শ মানুষের এসব সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ। একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সৃষ্টি করছে আরো দশটি নিত্য-নতুন সমস্যা। একদিকে জোর দিয়েছে তো অন্যদিক উপেক্ষিত হয়েছে। যার ফলে সমস্যা দিন দিন প্রকটই হয়েছে, সমাধান হয়নি। বস্তুতঃ ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানে অপারগতা ও ব্যর্থতা আজকের অন্যতম সংকট।

৬. পারলৌকিক মুক্তির দিকনির্দেশনা নেই: এ সভ্যতায় মানুষের পরকালের কোন স্থান নেই। সমগ্র চিন্তা ও কার্যক্রমই দুনিয়া কেন্দ্রিক। মৃত পরবর্তী জীবনের প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃত, উপেক্ষিত। মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে ভুলিয়ে দেয়াই এ সভ্যতার অন্যতম লক্ষ্য। এ সভ্যতার কাছে মানুষ পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে কোন সমাধান পাচ্ছে না। ফলে মানুষের জীবন নিক্ষিপ্ত হয়েছে লক্ষ্যহীনতার গভীর অন্ধকারে। জন্ম থেকে মৃত এ সীমা পর্যন্তই এ সভ্যতার চিন্তা ও কার্যক্রমের পরিধি। অথচ মানুষ তার মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাও জানতে চায়, বুঝতে চায় এবং সেখানকার জীবনের প্রস্তুতি কিভাবে হবে তা অবগত হতে চায়। কিন্তু জড়বাদী সভ্যতা এ ব্যাপারে নেতিবাচক উত্তর ছাড়া অন্য কোন সমাধান দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাই এ সমস্যার সমাধানে মানুষ এদিক ওদিক ছুটছে।

সংকটের মৌল কারণ

যেসব সংকট বর্তমান বিশ্বে পরিলক্ষিত হয়, যেসব সমস্যার সম্মুখীন আজকের মানুষ তার পিছনে রয়েছে বহুবিধ কারণ। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কারণগুলো বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার:

১. জীবন ও জগত সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা: একটি সুস্থ সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক এবং যথার্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। জগতের অস্তিত্ব, জীবনের আবির্ভাব, মানুষের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে জড়বাদী ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই বর্তমান সভ্যতা গড়ে উঠেছে। অথচ এসব ব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, নয় যৌক্তিক এবং পর্যাপ্ত। কোন সুস্থ মন এ ধরণের ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারে না এবং এসবের ভিত্তিতে একটি সুস্থ সমাজ-সভ্যতা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়।

২. মানব জীবনের লক্ষ্যহীনতা: পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদার উপর নির্ভর করে মানুষ কিভাবে দায়িত্ব পালন করবে, অপরাপর মানুষ ও জাতি সমূহের সাথে তার সম্পর্ক কি হবে। মানবজীবনের লক্ষ্যও নির্ধারিত হবে তার অবস্থান ও মর্যাদার আলোকেই। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা মানুষের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা অত্যন্ত হীন ও যান্ত্রিক। কোন মহৎ লক্ষ্য তার সামনে পেশ করতে পারেনি। ফলে মানবজীবন হয়ে পড়েছে লক্ষ্যহীন। লক্ষ্যহীন ব্যক্তি মানুষ ও মানুষের সমাজ কোনক্রমেই সঠিক পথে চলতে

পারে না। লক্ষ্যহীন জীবন হয়ে দাড়ায় অর্থহীন ও নৈরাশ্যপূর্ণ, দায়িত্বহীন। এ থেকে সৃষ্টি হয় হাজারো সমস্যা।

৩. বস্তুতান্ত্রিকতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতঃ যত সমস্যা আজ সৃষ্টি হয়েছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে মানুষকে এ সভ্যতা বস্তুতান্ত্রিকতা ও ইন্দ্রীয়পরায়ণতা শিক্ষা দিয়েছে। ভোগ-লালসা, ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থকরণ, ধন পুঞ্জিভূত করা, বস্তুগত প্রতিযোগীতা ইত্যাদি হচ্ছে বস্তুবাদী সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। বস্তুই হয়ে পড়ে সব কিছুর মাপকাঠি। নীতি-নৈতিকতা, মানবিকতা, দয়া ইত্যাদি হয়ে পড়ে গৌণ। বস্তুগত লাভালাভই সবকিছুর মানদণ্ড হয়ে পড়ে। দয়া, ভালবাসা, মানবিকতা, দরদ, অনুভুতি, বন্ধুত্ব সবকিছুই বাণিজ্যিক বিষয় হয়ে দাড়ায়। এ অবস্থায় সমাজে কোন সুস্থতা বিরাজ করা সম্ভব নয়। কোন মানবিক সমাজও গড়ে উঠতে পারে না। বাণিজ্যিকধর্মী স্বার্থ নির্ভর যান্ত্রিক সমাজই গড়ে উঠতে পারে। বর্তমান পশ্চিমা সমাজে তাই পরিলক্ষিত হয়।

৪. প্রান্তিকতা ও ভারসাম্যহীনতাঃ যে কোন সুস্থ ও গতিশীল সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন প্রান্তিকতামুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও কর্ম। কিন্তু বর্তমানে জড়বাদী ধর্মহীন সমাজ সভ্যতা ভারসাম্যহীনতা ও প্রান্তিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। চিন্তা, তত্ত্ব, কর্ম সর্বক্ষেত্রেই বিরাজ করছে প্রান্তিক মনোভাব ও ভারসাম্যহীন অবস্থা। জীবনের সমস্ত দিকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব জড়বাদী সমাজ সভ্যতার স্বীকৃত নয়। ফলে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ ও বিশ্লিষ্টতা, অসংগতি, সংহতির অভাব ইত্যাদি আজ নিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারসাম্যহীন সমাজ কখনো প্রকৃত উন্নতি ও প্রগতির পথে চলতে পারে না। বস্তুগত উন্নতি হচ্ছে অথচ মানবিকতা অধোগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেহ সুস্থ হচ্ছে বটে কিন্তু মন-আত্মা যাচ্ছে মরে। এ পরিস্থিতি সন্দেহতীতভাবে সমাজ সভ্যতাকে গভীর সংকটে ফেলতে বাধ্য। বাস্তবে হয়েছেও তাই। বর্তমানে যে সমস্ত সমস্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি সেগুলো অনেকটাই ভারসাম্যহীন চিন্তা ও কর্মেরই বহিঃপ্রকাশ।

৫. স্থায়ী মূল্যবোধের অভাব এবং আপেক্ষিক চিন্তা ও মূল্যবোধের প্রাধান্যঃ মানুষের জীবন গতিশীল বিকাশমান। এখানে আছে দু' ধরণের প্রবণতা-একটি সার্বজনীন অপরটি আপেক্ষিক ও পরিবর্তনযোগ্য। সার্বজনীন দিক হচ্ছে মূখ্য। তাই সুস্থ সমাজ নির্মাণ করতে হলে মানুষের সার্বজনীন চিরন্তন শাশ্বত দিকগুলোকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। সার্বজনীন প্রবণতা থেকে সৃষ্ট সার্বজনীন মুল্যবোধগুলোকে করতে হবে সংরক্ষণ। আপেক্ষিক ও পরিবর্তনযোগ্য দিকগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এর ব্যতিক্রম হলে সমস্যা সৃষ্টি হতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় মানব জীবনের চিরন্তন মূল্যবোধকে উপেক্ষা করা হয়েছে। সব কিছুকে আপেক্ষিক মনে করার প্রবণতা এখানে প্রবল। কোন কিছুই চিরন্তন নয়-সবই আপেক্ষিক এ ধরণের চিন্তা-চেতনা মানব জীবনের ও মানব সমাজের স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব বিনষ্ট করতে বাধ্য। সমাজে ও জীবনে যা সার্বজনীন তাকে সার্বজনীন বলে গ্রহণ করা, যা আপেক্ষিক তাকে সেভাবে গ্রহণ করার উপরই নির্ভর করে একটি সুস্থ, সঠিক ও গতিশীল সমাজ নির্মাণ করা। কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় সবকিছুকে আপেক্ষিক মনে করার তীব্র প্রবণতা শুধু বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা ও নীতিহীনতারই জন্ম দিয়েছে। মানবিক মূল্যবোধ আজ উপেক্ষিত। প্রয়োগবাদই সবকিছুর মানদণ্ড হয়ে পড়েছে। ফলে মানব সভ্যতা আজ ধ্বংসের সম্মুখীন।

৬. সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শোষণ-নিপীড়নঃ পশ্চিমা জড়বাদী সভ্যতার অন্যতম বৈশ্বিকরূপ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ। পশ্চিমা সভ্যতাটা গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী প্রক্রিয়ায় শোষণ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি ও প্রক্রিয়া চলতি সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। গোটা মানবজাতি এ প্রক্রিয়ার শিকার। অবশ্য এ সভ্যতার উন্মেষকাল হতে এ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী কার্যক্রমের ধরণ পালটেছে রূপ বদলেছে কিন্তু মূল চরিত্র একই রয়েছে। অর্থাৎ দুর্বল রাষ্ট্র সমূহকে শোষণ-লুণ্ঠন করা, তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করা। বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জড়বাদী সভ্যতার মোড়ল হিসেবে দুনিয়া জোড়া সাম্রাজ্যবাদী, নব্য-উপনিবেশবাদী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে মানবজাতির বিষফোঁড়া। যতদিন এর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের কোন কল্যাণ নেই, স্বস্তি নেই। আর একটি বিষয়ও প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, চলতি দুনিয়ার অন্যতম বিভৎসরূপ বর্ণবাদ ও ইয়াহুদীবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই অনুষঙ্গী। সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট হয়ে বিশ্বজোড়া বর্ণবাদী ও ইয়াহুদীবাদী শক্তি টিকে আছে। তারা একে অন্যের সহযোগী। তাছাড়া জাতিগত নিপীড়ন, আধিপত্য বিস্তার, শোষণ সবকিছুই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের অংশ। মূলকথা বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যতদিন টিকে আছে পৃথিবীর সংকটের কোন সমাধান হবে না। বৈষয়িক সংকট ও সমস্যা সৃষ্টির মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার তৎপরতা। তাই সাম্রাজ্যবাদের অবসান না হওয়া পর্যন্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

বর্তমান জড়বাদী সভ্যতার পতন অনিবার্য

বর্তমান পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, সৃষ্ট সংকট ও তার কারণসমূহ পর্যালোচনা করলে এ সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বর্তমান জড়বাদী সভ্যতা অন্তঃসারশূণ্য হয়ে পড়েছে। এটি পতনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এর উপযোগীতা ও কার্যকারীতা ফুরিয়ে এসেছে। তার জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু সে সমস্যা ও সংকটই সৃষ্টি করছে। এমনি অবস্থায় পতনই হবে তার ভবিষৎ। বর্তমান জড়বাদী সভ্যতার পতনের বিষয়টি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

পশ্চিমা দার্শনিক তত্ত্বের আলোকে

ইতিহাস বিশ্লেষণে পশ্চিমা জগতে যে সমস্ত তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটেছে সে সব তত্ত্বও পশ্চিমা জড়বাদী সভ্যতার পতনের বিষয়টিকে নিশ্চিত করে। এ পর্যায়ে হেগেলের দ্বান্দ্বিক ভাববাদ, মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং প্যারিটো, সরোকিন, স্পেংলার, ওয়েনবি প্রমূখের চক্রতত্ত্ব সবই বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতার পতনের দিকেই ইঙ্গিত করেছে।

হেগেলের তত্ত্বানুসারে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ইতিহাস অগ্রসর হয়। প্রচলিত ব্যবস্থা যা হেগেলের মতানুসারে অস্তি, তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন বিরোধ নিহিত রয়েছে। সময়ের ব্যবধানে প্রচ্ছন্ন বিরোধটি বিকশিত হয়ে একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠে যাকে হেগেল নাস্তি বলেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে দু' ব্যবস্থার সমন্বয়ধর্মী ব্যবস্থা গড়ে উঠে। পশ্চিমা সভ্যতার পুঁজিবাদ হচ্ছে অস্তি, সমাজতন্ত্র হচ্ছে নাস্তি। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে সমন্বয়ধর্মী একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ের পতন হতে বাধ্য। কাজেই বর্তমান জড়বাদী সভ্যতার অস্তি ও

নাস্তি উভয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কাজেই এখন তার পতনের পালা। এ প্রেক্ষিতে সমন্বয়ধর্মী একটি আদর্শের দিকে ইতিহাস এগিয়ে যাবে।

মার্কসের তত্ত্বানুসারে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ইতিহাস অগ্রসর হয়। সংগ্রাম সংঘটিত হয় দুটো প্রধান শ্রেণীর মধ্যে। বর্তমান জড়বাদী পুঁজিবাদী সভ্যতায় কার্লমার্কস দু'টো প্রধান শ্রেণী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, তার পতন অবশ্যম্ভাবী। আবার একই তত্ত্ব দ্বারা প্রচলিত সমাজতন্ত্রের পতনের অনিবার্যতাও বিশ্লেষণ করা যায়।

চক্রতত্ত্ব অনুসারে ইতিহাস চক্রাকারে আর্বতিত হয়। জন্ম-বিকাশ, মৃত একটি সমাজ সভ্যতার জন্য অনিবার্য ঠিক জীবনচক্রের মতোই। এ তত্ত্বানুসারে পশ্চিমা সভ্যতা তার বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গিয়েছে। তাই তার পরবর্তী স্তর অনিবার্যভাবেই পতন।

কুরআনী বিশ্লেষণ

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে একটি সমাজ সভ্যতার পতনের কারণ ও লক্ষণ হচ্ছে প্রধানত: নিম্নরূপ-

১. ***পাপাচার:*** একটি নেতৃত্ব দানকারী জাতি বা সভ্যতার ধারক-বাহক লোক-সমষ্টি যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, নৈতিকতার সব বাধন যখন ঢিলে হয়ে যায়, অন্যায়-অনাচার-সীমালংঘন যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন পতনই হয় তার ভাগ্য লিপি। আল-কুরআন বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছে:

اَلَمۡ يَرَوۡا كَمۡ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَبۡلِهِمۡ مِّنۡ قَرۡنٍ مَّكَّنّٰهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ مَا لَمۡ نُمَكِّنۡ لَّكُمۡ وَ اَرۡسَلۡنَا السَّمَآءَ عَلَيۡهِمۡ مِّدۡرَارًا ۪ وَّ جَعَلۡنَا الۡاَنۡهٰرَ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهِمۡ فَاَهۡلَكۡنٰهُمۡ بِذُنُوۡبِهِمۡ وَ اَنۡشَاۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ قَرۡنًا اٰخَرِيۡنَ

"তারা কি দেখে নাই যে তাদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকেই ধ্বংস করেছি যারা নিজ নিজ সময়ে অতিশয় শক্তিশালী ছিলো। যমীনের বুকে তাদেরকে এতদুর ক্ষমতা-আধিপত্য দান করেছিলাম যা তোমাদের দান করিনি।.... শেষ পর্যন্ত তাদের পাপাচারের জন্য তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের স্থলে পরবর্তী পর্যায়ে জাতি সমূহকে অভিষিক্ত করলাম।" (সূরা আনআম: ৬)

বর্তমান জড়বাদী সভ্যতার ধারক-বাহকরা যে চরম পাপাচার ও সীমালংঘনে লিপ্ত তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

২. ***ভোগ-বিলাস:*** পতনের আরেকটি কারণ হচ্ছে চরম ইন্দ্রীয়পরায়ণতা ও ভোগ-বিলাস। খাও দাও ফুর্তি কর- এই যখন হয় নীতি তখন পতন ঘনিয়ে আসতে সময় লাগে না। আল-কুরআনের ভাষায়:

فَلَمَّا نَسُوۡا مَا ذُكِّرُوۡا بِهٖ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ اَبۡوَابَ كُلِّ شَىۡءٍ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوۡا بِمَاۤ اُوۡتُوۡۤا اَخَذۡنٰهُمۡ بَغۡتَةً فَاِذَا هُمۡ مُّبۡلِسُوۡنَ

“অতঃপর তারা যখন তাদের প্রতি যে নসীহত করা হয়েছিলো তা ভুলে গেল, তখন সকল প্রকার স্বচ্ছলতার দ্বার তাদের জন্য খুলে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তারা তখন তাদেরকে দেয়া নিয়ামত ও প্রাচুর্যে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে গেলো তখন আমরা সহসা পাকড়াও করেছি। এখন অবস্থা এই হলো যে, তারা সকল কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে গেলো।” (সূরা আনআম: ৪৪) সকল

পশ্চিমা সভ্যতা যে আজ একটি চরম বিলাসী ইন্দ্রীয়পরায়ণ সভ্যতা তাতো সুস্পষ্ট।

বাং

৩. জুলুম: একটি জাতি বা সভ্যতা যখন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পাওয়ার পর জুলুম-অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু করে, অন্যায়-বেইনসাফী ভারসাম্যহীনতা যখন প্রকট হয়ে উঠে তখনই তা পতনের দিকে এগিয়ে যায় সবার অলক্ষ্যেই। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআন বলছে:

وَ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ وَ مَا كَانُوۡا لِیُؤۡمِنُوۡا ؕ كَذٰلِكَ نَجۡزِی الۡقَوۡمَ الۡمُجۡرِمِیۡنَ

“হে লোকেরা! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা জুলুমের আচরণ অবলম্বন করেছিল.....।” (সূরা ইউনুস: ১৩)

وَ كَمۡ قَصَمۡنَا مِنۡ قَرۡیَةٍ كَانَتۡ ظَالِمَةً وَّ اَنۡشَاۡنَا بَعۡدَهَا قَوۡمًا اٰخَرِیۡنَ

“কত অত্যাচারী জনবসতিই এমন আছে যেগুলোকে পিষে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছি।” (সূরা আম্বিয়া: ১১)

পশ্চিমা পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা যে একটি অত্যাচারী-জালিম সভ্যতা এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

৪. অসৎ ও শঠ লোকদের নেতৃত্ব: একটি জাতির পতন তখনই তরান্বিত হয় যখন অসৎ, প্রতারক, অপরাধী শ্রেণীর লোকেরা সমাজ সভ্যতার নেতৃত্বে আসীন হয়। কুরআনের ভাষায়:

“এমনিভাবে আমি প্রতিটি জনপদে তার বড় বড় অপরাধীদিগকে কর্তৃত্ব দিয়েছি যেন তথায় তারা নিজেদের চক্রান্ত-ধোকা-প্রতারণার জাল বিস্তার করে। মূলতঃ তারা নিজেদের প্রতারণার জালে নিজেরাই জড়িত হয়ে পড়ে কিন্তু এর চেতনা তাদের নেই।” (সূরা আনআম: ২৩)

সর্বাপেক্ষা প্রতারক, ধোকাবাজ, চক্রান্তকারী লোকেরাই আজ সমাজ সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে।

৫. স্বচ্ছল-ধনিক শ্রেণীর সীমালংঘন, অনাচার, পাপাচার: কোন জাতির পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ঐ জাতির ধনিক শ্রেণীর ভূমিকা। যখন ধনিক শ্রেণীর কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে যায়, সর্বপ্রকার অন্যায়-অত্যাচার-অনাচারে ধনিক শ্রেণী লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন সে জাতি ধংসের দিকেই এগিয়ে যায়। কুরআনের ভাষ্য:

وَ اِذَاۤ اَرَدۡنَاۤ اَنۡ نُّهۡلِكَ قَرۡیَةً اَمَرۡنَا مُتۡرَفِیۡهَا فَفَسَقُوۡا فِیۡهَا فَحَقَّ عَلَیۡهَا الۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنٰهَا تَدۡمِیۡرًا

“আমরা যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেই তখন তার স্বচ্ছল লোকদের (প্রাকৃতিকভাবে) নির্দেশ দিই, আর তারা সেখানে সর্বপ্রকার সীমালংঘন ও অন্যায় শুরু করে দেয়। তখন শাস্তির ফায়সালা ঐ জনপদের ভাগ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমরা তাকে ধ্বংস করে দিই।” (সূরা বনী ইসরাঈল: ১৬)

বর্তমান পুঁজিবাদী দুনিয়ার ধনিক গোষ্ঠীর ভূমিকা ও তৎপরতা সবার সামনেই তো পরিস্কার। শোষণ-নির্যাতন, পাপাচার-অনাচার, সবই তাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হলো যে, পতনের কারণ ও লক্ষণ হিসেবে যে পাঁচটি বিষয় অর্থাৎ ১) পাপাচার, ২) ভোগ বিলাস-ইন্দ্রীয়পরায়ণতা, ৩) জুলুম-অত্যাচার, ৪) ধোকাবাজ ও অপরাধী শ্রেণীর নেতৃত্ব এবং ৫) ধনিক শ্রেণীর সীমালংঘনমূলক তৎপরতা দায়ী, বর্তমান জড়বাদী, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতায় তা পূর্ণভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাজেই কুরআনিক বিশ্লেষণ অনুসারে এ সভ্যতার পতন অনিবার্য। এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

জড়বাদী সভ্যতার পতনের অনিবার্যতা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের “পতনের বেলাভূমিতে বস্তুবাদী সভ্যতা” বইটি দ্রষ্টব্য।

আগামী দিনের সভ্যতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যাবলী

বর্তমান জড়বাদী সভ্যতা ও তদসংশ্লিষ্ট আদর্শগুলোর ব্যর্থতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে গভীর সংকট, সৃষ্টি হচ্ছে ঐতিহাসিক শূন্যতা। এ সংকটের সমাধান ও ঐতিহাসিক শূন্যতা পূরণে একটি বিকল্প আদর্শ ও সভ্যতা প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন-সম্ভাব্য বিকল্প সভ্যতা ও আদর্শটির মৌল প্রকৃতি ও চরিত্র কেমন হবে? কোন সব অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যাবলী তার মধ্যে থাকতে হবে? বর্তমান সভ্যতার সংকট ও সৃষ্ট ঐতিহাসিক শূণ্যতার প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে আগামী দিনের বিকল্প সভ্যতা ও আদর্শের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অপরিহার্য বলে প্রতীয়মান হয়:

১. আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মবোধ: আদর্শিক সংকট ও ঐতিহাসিক শূন্যতা বস্তুবাদী সভ্যতার ব্যর্থতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তাই ইতিহাস স্বাভাবিকভাবেই দাবী করছে এমন একটি সভ্যতা ও আদর্শ যার দার্শনিক ভিত্তি হবে বস্তুবাদের বিপরীতে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মবোধ। প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী সরোকিনের পর্যবেক্ষণ অনুসাওে সমাজ সর্বদাই একবার ইন্দ্রীয়পরায়ণতার দিকে আবার তার বিপরীতে আধ্যাত্মিকতার দিকে আবর্তিত হয়। আর ইন্দ্রীয়পরায়ণতার দার্শনিক ভিত্তি মূলত: বস্তুবাদ। কাজেই সরোকিনের তত্ত্বানুসারে বলা চলে বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার পতন মানেই একটি আধ্যাত্মবাদী ও ধর্ম ভিত্তিক সভ্যতার দিকে ইতিহাস আবর্তিত হওয়া। গতিবিদ্যার সূত্রানুসারে ব্যাপারটি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বৈজ্ঞানিক নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রানুসারে প্রত্যেক ক্রিয়ার (তা যে দিকেই হোক না কেন) সমপরিমাণ অথচ বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বস্তুবিজ্ঞানে এটি প্রমাণিত সত্য। সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি আমরা এ তত্ত্বটি প্রয়োগ করি তাহলে বলা যায় যে, বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি হচ্ছে আধ্যাত্মবাদ ও ধর্মবোধ এবং আস্তিকতা। তাই যে সভ্যতার ভিত্তি বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা এবং ধর্মের অস্বীকৃতি তার ব্যর্থতা ও পতন

নিঃসন্দেহে এক বিপরীত মতাদর্শ আধ্যাত্মবাদ ধর্মবোধ ও আস্তিকতার দিকে ইতিহাসকে পরিচালিত করবে। হেগেলের ইতিহাস দর্শন অনুসারে প্রতিটি অস্তি থেকে নাস্তির জন্ম। বস্তুবাদ, নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মহীনতা যদি বর্তমান অবস্থার অস্তি হয়, তাহলে ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বিকাশের নিয়মেই তার বিপরীত ভাবধারা আধ্যাত্মবাদ, ধর্মবোধ ও আস্তিকতা ভিত্তিক সভ্যতার আবির্ভাব অনিবার্য। সাধারণ যুক্তি বিশ্লেষণও একথা বলছে যে, কোন সভ্যতা বা আদর্শ যদি ব্যর্থ ও প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে তার মূল ভিত্তিটি ধ্বসে পড়া অনিবার্য। তাই বিকল্প সভ্যতা ও আদর্শ অনিবার্যভাবেই প্রচলিত পতনশীল সভ্যতার বিপরীতমুখী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। বস্তুবাদী, ধর্মহীন, নাস্তিক্যতাবাদী বর্তমান আদর্শ ও সভ্যতার ব্যর্থতা সত্ত্বেও মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সে আদর্শই ধরে রাখবে এমনটা অযৌক্তিক ও অসম্ভব। মানুষের স্বাভাবিক মনঃস্তত্ব ও প্রবণতা তার বিপরীতমুখী আদর্শের দিকেই ধাবিত হবে। মানুষ আধ্যাত্মিকবাদী ধর্ম ভিত্তিক আদর্শেরই অনুসন্ধান করবে। কাজেই বলা চলে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মবোধই হবে আগামী দিনের কাম্য সভ্যতা ও আদর্শের মূলভিত্তি।

২. বস্তুগত উন্নয়ন অব্যাহত থাকা: মানবজাতির সভ্যতা সমূহকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটি সভ্যতার দুটো প্রধান দিক থাকে। ক) বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত দিক এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক দিক, খ) অবস্তুগত, আদর্শিক বা সাংস্কৃতিক দিক। সভ্যতার বস্তুগত ও প্রযুক্তির দিকটি ক্রম-বিকাশ নিয়মের অধীন। আর প্রযুক্তির ক্রম-বিকাশ নিয়ম আমাদের বলছে যে, সময় যতই অতিবাহিত হবে ততই প্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে (গতি কম বা বেশী হতে পারে)। প্রযুক্তির দিক থেকে ইতিহাস পিছনে যেতে পারে না। যেহেতু প্রযুক্তি ও বস্তুগত দিকটা মানব অভিজ্ঞতার ফসল এবং সঞ্চিত ভাণ্ডার তাই গোটা মানবজাতিই হচ্ছে প্রযুক্তির উত্তরাধিকার- বিশেষ কোন জাতি বা সভ্যতা নয়। এজন্য কোন জাতি বা সভ্যতার পতন ঘটলেও তার প্রযুক্তির মানের পরিবর্তন ঘটে না (বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া)। বরং বিজয়ী আদর্শ বা সভ্যতার হাতে স্থানান্তর হয় মাত্র। প্রযুক্তির উন্নয়নের ধারা নতুন সভ্যতাকেও অব্যাহত রাখতে হয়।

বর্তমান সভ্যতার অধীনে বস্তুগত উপায়-উপকরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিহাস যে পর্যায়ে উপণীত হয়েছে তা থেকে পিছনে যাওয়া ইতিহাসের ক্রমবিকাশ নিয়মের বিরোধী। কাজেই আগামী দিনের বিকল্প সভ্যতা ও আদর্শকে অবশ্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বস্তুগত উন্নয়নকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক হতে হবে। অর্থাৎ ইতিহাসের চাকাকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে বিকল্প আদর্শের যোগ্যতা থাকতে হবে। এমন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আদর্শ আগামী দিনের বিকল্প সভ্যতা হতে পারবে না, যা প্রকৃতি ও চরিত্রের দিক থেকে বস্তুগত উন্নয়নের পরিপূরক নয় বা বর্তমান উন্নয়নের মানকে ধারণ করে আরো সমৃদ্ধি দানে সক্ষম নয়।

৩. মানব জীবনের বহুমুখী সমস্যার ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানের যোগ্যতা: বর্তমান জড়বাদী সভ্যতা মানবজাতির বিভিন্নমুখী বাস্তব সমস্যা সমাধান ও প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণেও এ সভ্যতা ব্যর্থ হয়েছে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমস্যা, দারিদ্র সমস্যা, শোষণ-লুণ্ঠন-বৈষম্য, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও জুলুম, জাতিগত সংকট কোন কিছুরই সুষ্ঠু সমাধান

বর্তমান সভ্যতা দিতে পারেনি। সমস্যা সমাধানের নামে সমস্যা শুধু বাড়িয়েই তুলেছে। তদুপরি সমাধান যা দিয়েছে তা হচ্ছে একদেশদর্শী, একপেশে ও প্রান্তিকধর্মী, ভারসাম্যহীন। অথচ প্রকৃতিতে প্রান্তিকতা ও ভারসাম্যহীনতার স্থান নেই।

প্রকৃতিরাজ্যে বিরাজ করছে এক বিস্ময়কর ভারসাম্য। যেখানে প্রান্তিকতা, ভারসাম্যহীনতা সেখানেই ধ্বংস ও ব্যর্থতা। বর্তমান জড়বাদী সভ্যতা ও সমাজ মানবজাতির প্রতিটি দিক ও বিভাগের চাহিদা পূরণে ভারসাম্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিশৃঙ্খলতা, নৈরাজ্য, সামাজিক-মনোজাগতিক অস্থিরতা, নৈরাজ্য, গোজামিল। এমনি অবস্থায় শুধু প্রযুক্তির উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল হয়ে একটি সমাজ-সভ্যতা দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। তাই বিকল্প সমাজ সভ্যতা-আদর্শের অনিবার্য প্রয়োজন। কিন্তু সে বিকল্প আদর্শকে অবশ্যই বর্তমান জীবন সমস্যার সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানে সক্ষম হতে হবে। কেননা বর্তমান আদর্শিক সংকটের দাবীই হচ্ছে এমন একটি সমাজ-সভ্যতা ও আদর্শ যা মানব জীবনের সবদিকের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করবে, যা আত্মা ও বস্তুর, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সমন্বয় ঘটাবে, যা হবে প্রান্তিকতামুক্ত, ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপথ। আজকের মানবতা সেদিকেই তাকিয়ে আছে।

৪. বিশ্বভ্রাতৃত্ব: মানব সমাজের যাত্রা শুরু হয়েছিলো একজন পুরুষ ও একজন নারীর সমন্বয়ে গঠিত একটি সরলতম সমাজ থেকে। তারপর বিভিন্ন কার্য কারণের সূত্র ধরে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা, অসুবিধা ইত্যাদির ফলে সমাজ জটিল হয়েছে। মানবজাতির মধ্যে এসেছে বিভেদ, বিভক্তি, সংঘাত। প্রাথমিক প্রাকৃতিক আদর্শ (ঐশী হেদায়েত) থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ বিভিন্ন পথ ও মত গ্রহণ করেছে এবং গড়ে তুলছে একের সাথে অন্যের দুস্তর ব্যবধান। যুগে যুগে নবীগণ মানব জাতির সঠিক পরিচয় ও তাদের ঐক্যসূত্র তুলে ধরে অখন্ড ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু অনেকগুলো কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট কারণ ছাড়াও এমন সব প্রাকৃতিক ও বাস্তব প্রতিবন্ধকতা ছিলো যা রাতারাতি দূর করা সম্ভব ছিলো না। একদিকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি বিভেদ অন্যদিকে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা অখন্ড মানবজাতি গড়ে তোলার পথে অলংঘনীয় বাধা হয়ে দাড়িয়ে ছিলো। বিগত ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বংশ, জাতি বা শ্রেণী-বিদ্বেষ নির্ভর বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার অভিজ্ঞতা মানবজাতি অর্জন করেছে। এসব সংকীর্ণ চেতনার বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক অসারতা পূর্বের চেয়ে এখন অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আদিম সরলতম একই আদর্শ ভিত্তিক সমাজ থেকে বিচ্যুত সমাজ ও সভ্যতা হাজার হাজার বছরের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ক্রমবিকাশের পথ ধরে ভিন্ন আঙ্গিকে আবার এক মহাভ্রাতৃত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আকুতি সৃষ্টি হচ্ছে। কেননা, ইতিহাস বিকাশের এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, বংশ-বর্ণ-গোত্র-জাতি-শ্রেণী বিদ্বেষ ও বিভেদ ভিত্তিক সমাজ সভ্যতার অকল্যাণকারীতা, তার অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রকট হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে মানবজাতি সচেতন হচ্ছে এবং এগুলোর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ঐতিহাসিক আকুতি ও ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই বর্তমান পৃথিবীর অন্তর্নিহিত দাবী হচ্ছে এমন একটি সমাজ সভ্যতা, এমন একটি আদর্শ যা সমগ্র মানবতাকে এক অখন্ড জাতিতে পরিণত করার মতো যোগ্যতা রাখে। যা যাবতীয় কৃত্রিম বন্ধন ও বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠে এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির সার্বজনীন মানদণ্ড তুলে ধরতে সক্ষম হবে। অতীতে বিশ্ব মানবজাতি গড়ে উঠার পথে কৃত্রিম ও মানব সৃষ্ট

প্রতিবন্ধকতার সাথে সাথে কতগুলো প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রতিবন্ধকতাও ছিলো। যেমনঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, বিজ্ঞানের উন্নয়নের প্রাথমিক অবস্থা, ঐতিহাসিক অনভিজ্ঞতা, জাতিসমূহের বিচ্ছিন্নতা ও পারস্পরিক পরিচিতির অভাব ইত্যাদি। কিন্তু ইতিহাস এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, প্রাকৃতিক স্বাভাবিক অসুবিধাগুলো ক্রমেই দুর হয়ে যাচ্ছে। শুধু মানব সৃষ্ট কতকগুলো কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতাই যেমনঃ জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, শ্রেণীবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি আজ বিশ্ব মানবজাতি গঠনের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। কাজেই আগামী দিনের বিকল্প সমাজ-সভ্যতা ও আদর্শের এমন বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য যা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথে মানবজাতিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।

ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশ

বর্তমান জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি সংকট এবং এর পতনের সম্ভাব্যতার প্রেক্ষিতে ঐশী আদর্শ ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা, সৃষ্ট সংকট সমাধানের যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণের জন্য ইসলামের আবির্ভাব ঐতিহাসিক অবস্থান, এর মৌল বৈশিষ্ট্যাবলী পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। নিম্নে এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলোঃ

মানব ইতিহাসের দুটি ধারা

প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) কে নিয়ে মানব জাতির প্রথম পরিবার গঠিত হয়। তাদেরই সন্তান-সন্ততি সমন্বয়ে গড়ে উঠে আদিমতম সমাজ। সে সমাজটি ছিলো সরল, সহজ, ন্যায়ানুগ ও একই আদর্শের অনুসারী। পার্থিব-অপার্থিব সব দিক থেকে ছিলো পূর্ণ ঐক্য। তাওহীদ ছিলো আদর্শের ভিত্তি। তাওহীদভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলো সমাজটি। সেই আদিমতম সমাজ প্রসংগে আল-কুরআনের বক্তব্য:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً

"মানবজাতি প্রথম একই উম্মতভুক্ত ছিলো।" (সূরা বাকারা: ২১৩)

অর্থাৎ আদিতে মানবজাতি একই সমাজভুক্ত ছিলো। সে সমাজে ইহ-জাগতিক বা পরজাগতিক কোন বিষয়েই মতভেদ ও বিরোধ ছিল না, ছিলো না কোন ব্যবধান। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা ছিলো এর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাওহীদ ভিত্তিক সমরূপ সরল সমাজটি নানা প্রাকৃতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, বংশগত ইত্যাদি কারণে আদিরূপে থাকতে পারেনি। সময়ের ব্যবধানে সরলতম সমাজটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সম্প্রসারিত ও জটিল হতে থাকে। কালক্রমে সমাজে সৃষ্টি হলো বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য, দেখা দিল বিভক্তি। আল-কুরআনের ভাষায়:

وَ مَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۚ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

“প্রথমে মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিলো। পরে তারা বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ করলো (অর্থাৎ নানা পথ ও মত তৈরী করে নিল)।” (সূরা ইউনুসঃ ১৯)

মানব সমাজের মধ্যে যে পার্থক্য ও মতবিরোধের সূচনা হয় তা সমাধানের জন্য নিছক প্রাকৃতিক বিধান যথেষ্ঠ ছিলো না। এর জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় খোদায়ী বিধানের। আল্লাহ তাআলা মানব সমাজের প্রাথমিক বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করলেন। কুরআনের ভাষা:

ۚ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۪ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ

“অতঃপর আল্লাহ নবী প্রেরণ করলেন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে এবং তাঁদের সঙ্গে সত্যতা সহকারে কিতাব নাযিল করলেন যেন মানুষ যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করছিল সেসব বিষয়ে বিচার-ফায়সালা করতে পারেন।” (সূরা বাকারা: ২১৩)

নবীর আগমন ও কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য ছিলো মানব সমাজের মতবিরোধ দুর করে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। কিন্তু সমাজের যারা বেশী অধিকার দাবী করছিল, যারা প্রাধান্য অর্জন করতে চেয়েছিল, যারা বাড়াবাড়ি করতে কৃতসংকল্প ছিলো তারা নবী (আ.) কর্তৃক পেশকৃত বিধি-বিধান মানতে প্রস্তুত হলো না। বরং তারা নতুন করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান ও ধর্মের ব্যাপারেই মতপার্থক্য শুরু করে দিল:

فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

“প্রকৃত সত্য ও সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং পথ-নিদের্শ পাওয়ার পরও শুধু পরস্পর বাড়াবাড়ি ও বিদ্বেষবশতঃই তারা মতবিরোধ করছিল। অতএব যারা ঈমান আনলো, তাদেরকে আল্লাহ নিজের অনুমতিক্রমে সত্যের পথ খোলেন যে সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করছিল।” (সূরা বাকারা: ২১৩)

নবী আসার পর মতবিরোধের কারণে বিভিন্ন অংশীবাদী ও প্রকৃতিবাদী ধর্মের, নাস্তিক্যবাদী তত্ত্ব ও বিধি-বিধানের আবির্ভাব ঘটে। কালক্রমে গোত্রবাদ, বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সহ নানা রকম মতবাদের জন্ম হয়। সবই ছিলো প্রকৃত সত্যকে অস্বীকৃতি তথা কুফরের ভিত্তিতে। মানব সমাজের দ্বিতীয় অংশটি সত্যকে মেনে নিয়ে তাওহীদপন্থী- ন্যায় ও সত্য দলে পরিণত হয়। এভাবেই মানবজাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়- এক দল মুমিন অন্য দল কাফের। এক দল নবীগণ প্রচারিত আদর্শ ইসলামের অনুসারী অন্য দল কুফরের অনুসারী। দু' আদর্শের মধ্যে শুরু হয় চিরন্তন দ্বন্দ্ব। একদিকে আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শ ইসলাম অন্য দিকে সে আদর্শের অস্বীকৃতি তথা কুফর। ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বই ইতিহাসের প্রকৃত সারনির্যাস। ইসলাম সত্যের সমর্থক, কুফর মানে নির্জলা মিথ্যা, অনাচার, অত্যাচার, শোষণ, অধোগতি, সত্য-ন্যায়ের অস্বীকৃতি। যুগে যুগে নবীগণ প্রকৃত সত্য, মানবজাতির মুক্তির আদর্শ ইসলামেরই প্রচার করেছেন। আর

নবীগণ (আ.) পেশকৃত আদর্শের মুকাবেলায় যুগে যুগে গড়ে উঠেছে নানা মতবাদ, ধর্মের নামে অধর্ম, বিকৃতি, কুসংস্কার ইত্যাদি। এভাবেই মানব ইতিহাস ইসলাম ও কুফর, সত্য ও মিথ্যা এ দু' ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আনীত আদর্শ

নবুয়তের ধারার শেষ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর মাধ্যমে পরবর্তী সর্ব যুগের জন্য ইসলাম পূর্ণাঙ্গ করে দেখা হয়। এর আগের নবীগণ ছিলেন বিশেষ যুগ বা জাতি সংশ্লিষ্ট। সমাজ বিকাশের প্রাথমিক স্তরগুলোতে তাঁদের আর্বিভাব। তাই তাঁদের আদর্শে চিরন্তন শাশ্বত নীতিমালার সাথে কিছু কিছু সাময়িক অন্তবর্তীকালীন বিধানও দেয়া হয়েছিলো। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইতিহাসের ক্রমবিকাশের এমন এক স্তরে আগমন করেন যখন গোটা মানব জাতির জন্য একই ধরণের বিধি-বিধান ও আদর্শ দেওয়ার বাস্তবতা ও পরিবেশ তৈরী হয়। তাই তাঁর মাধ্যমে গোটা মানবজাতির সর্বযুগের জন্য ইসলামী আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

মহানবীর নেতৃত্ব ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সপ্তম শতকের আরবে এক মহা বিপ্লব সংঘটিত হয়। এ বিপ্লবের আদর্শ, গোটা মানবজাতি এবং তার ইতিহাসে এর অনন্য ও স্থায়ী প্রভাবের দৃষ্টিতে এ বিপ্লব ইতিহাসের সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব। এ বিপ্লব গোটা মানবজাতির যে কোন যুগের জন্য ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, যুদ্ধ, শান্তি সব ব্যাপারেই মহান দৃষ্টান্ত, অনুপম নজীর।

মহানবীর (সা.) তিরোধানের পর মহান খলীফাগণের নেতৃত্বে খেলাফতে রাশেদার আমলে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্ণ অনুশীলন হয় এবং ইসলামের কল্যাণকারীতা দুনিয়াবাসী প্রত্যক্ষ করে।

মুসলমানদের বিচ্যুতি ও পতন

খেলাফতে রাশেদার পর শুরু হয় আদর্শিক বিচ্যুতি। ক্রমান্বয়ে দেখা দেয় অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়। এসব অবক্ষয় আর বিচ্যুতি সত্ত্বেও মুসলিম সভ্যতা তার বিশ্ব নেতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তার অব্যাহত রাখে। ১৩ শতক পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান থাকে। এর পর আসে প্রচণ্ড বিপর্যয়। একদিকে প্রাচ্যের জাগরণ।

মুসলমানদের আদর্শিক বিচ্যুতি, অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়, অনৈক্য ও স্থবিরতা আর বাইরের শক্তি সমূহের অব্যাহত চাপ, ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ সব মিলিয়ে মুসলিম সভ্যতা তার বিশ্ব নেতৃত্বের অবস্থান থেকে সরে আসতে থাকে। পরবর্তী কয়েক শতকের মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতা সংহত ও সমৃদ্ধ হয়ে বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে, তাদের নব আবিষ্কৃত প্রযুক্তির সহায়তায় বিশ্ব নেতৃত্ব করায়ত্ব করে নেয়। ১৯ শতকে এসে গোটা বিশ্ব ইউরোপীয় জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এভাবেই ইতিহাস পরিক্রমায় মুসলিম শক্তির হাত থেকে বিশ্ব নেতৃত্ব ইউরোপীয় শক্তির হাতে স্থানান্তর হয়ে যায়।

বিশ শতকের শেষপাদে এসে মানবজাতি উপলব্ধি করছে বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা আজ বিশ্ব নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। বিশ্বজোড়া সৃষ্টি হয়েছে এক ভয়াবহ আদর্শিক শূন্যতা। এখন এ শূন্যতা পূরণ করার জন্য এবং বিশ্ব সভ্যতার আগামী দিনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য যে ধরণের আদর্শ প্রয়োজন ইসলাম বর্তমানেও তা পূরণ করছে কি না তা বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্যক।

মহানবী (সা.)-এর আদর্শ তথা ইসলামের বৈশিষ্ট্য

মহানবী (সা.) যে আদর্শ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তা এমন সব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ যা বর্তমান পৃথিবীর যাবতীয় সংকট সমাধানে সক্ষম। যে সমস্ত সমস্যা ও সংকট আজকের দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে, যে আদর্শিক শূন্যতা পৃথিবীতে বিরাজ করছে তার একমাত্র সমাধান মহানবী (সা.)-এর আনীত আদর্শের মাধ্যমেই সম্ভব। মহানবী (সা.)-এর আদর্শের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান আঙ্গিকে পর্যালোচনা করলেই তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিম্নে মহানবী (সা.)-আদর্শের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর আলোকপাত করা হলো:

১. ***জীবন জগত ও তার স্রষ্টার যুক্তিসঙ্গত এবং সঠিক পরিচয়:*** যে কোন আদর্শের জন্য প্রথমেই তার মৌল দার্শনিক ভিত্তিটি নির্ণয় করতে হয়। দার্শনিক ভিত্তিটি ভুল হলে তার উপর দাড়ানো সমস্ত জীবন বিধানই সামগ্রিকভাবে ভুল হতে বাধ্য। বর্তমান সভ্যতা তা পুঁজিবাদী হোক আর কমিউনিজমই হোক মূলতঃ দার্শনিক বিচারে জড়বাদী। এ সভ্যতায় স্রষ্টার কোন স্বীকৃতি নেই। জীবন জগত সম্পর্কে বস্তুবাদী (যান্ত্রিক অথবা দ্বান্দ্বিক) ব্যাখ্যাই তার মূল নিয়ামক। জড়বাদের গোলক ধাঁধায় এ সভ্যতা আবর্তিত। অথচ জড়বাদের মাধ্যমে না জীবনের ব্যাখ্যা মিলে না জগতের আবির্ভাব ও বিকাশকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিশেষ করে আজকের জড় বিজ্ঞানের উন্নতি, নতুন নতুন তথ্য উদঘাটনে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, জড়বাদী ব্যাখ্যা নেহায়েতই অযৌক্তিক ও অপ্রতুল। তার যেমন বৈজ্ঞানিক-যৌক্তিক কোন ভিত্তি নেই তেমনি মানুষের মানসিক, আধ্যাত্মিক চাহিদাও জড়বাদ পূরণ করতে পারে না। প্রসঙ্গত একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে জড়বাদেরই সর্বোচ্চ দার্শনিক রূপ হচ্ছে সরাসরি নাস্তিকতা। জড়বাদের ধর্মীয় রূপ হচ্ছে শিরক ও পৌত্তলিকতা। জড়বাদের রাজনৈতিক রূপ হচ্ছে এক সীমায় পুঁজিবাদ অন্য সীমায় কমিউনিজম। এর নৈতিকতা হচ্ছে এক সীমায় ভোগবাদ, ইন্দ্রীয়পরায়ণতা, উপযোগবাদ অন্য সীমায় বৈরাগ্যবাদ, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, হতাশা অর্থাৎ দুই চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে জড়বাদের প্রভাবে।

মহানবী (সা.) সর্বযুগের জড়বাদ ও তার সমস্ত রূপ প্রকরণের মুকাবেলায় পেশ করেছেন তাওহীদের আদর্শ। তাওহীদ এক স্রষ্টার অস্তিত্ব ও জীবন জগতের সাথে তার সক্রিয় সম্পর্কের আদর্শ। তাওহীদ তত্ত্বই জীবন জগত ও তার যাবতীয় রূপের যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পেশ করতে পারে। তাওহীদের ধর্মীয় রূপ হচ্ছে একক স্রষ্টার আনুগত্য-উপাসনা, তাকে ভালোবাসা ও ভয় করা। তাওহীদের রাজনৈতিক রূপ হচ্ছে খেলাফত অর্থাৎ মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। তার নিদের্শের আওতায় যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করবে, কেউ আরো প্রভু হবে না, মালিক হবে না, একনায়ক হবে না। তাওহীদের সামাজিক চেতনা হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব বোধ ও সহযোগিতা। এর অর্থনীতি হচ্ছে সবার প্রয়োজন পূরণ, শ্রেণী প্রাধান্য ও আধিপত্যের অবসান, এর সাংস্কৃতিক রূপ হচ্ছে প্রেম-ভ্রাতৃত্ব-দরদ,

সৌন্দর্য, সামাজিক কল্যাণ, ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ। তাওহীদের আন্তর্জাতিক ভাবধারা হচ্ছে বিশ্ব রাষ্ট্র, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা আর শ্রেণীশোষণ, শ্রেণী প্রাধান্য, জাতিগত নিপীড়ন, বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসীবাদের অবসান। মূলকথা তাওহীদের দার্শনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভাবধারা ও প্রভাব অতীব বিস্তৃত। জীবন ও জগতের যথার্থ ব্যাখ্যাও তাওহীদের তত্ত্বেই নিহিত। জীবনের অর্থ ও গতিময়তারও সঠিক ব্যাখ্যা তাওহীদ তত্ত্বেই সম্ভব। মহানবী (সা.) তাই পরম তত্ত্ব ও সত্য তাওহীদের প্রচার করে গেছেন এবং তার আনীত আদর্শের মূল ভিত্তিই হচ্ছে তাওহীদ।

২. *এ পৃথিবীতে মানুষের অবস্থানের সঠিক ব্যাখ্যা:* পৃথিবীতে যে কোন জীবন বিধান রচনা করার জন্য পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদার বিষয়টির সমাধান প্রয়োজন। বর্তমান জড়বাদী সভ্যতায় মানুষকে নিছক পশুর (বুদ্ধিমান পশু) উর্ধ্বে বিবেচনা করা হয়নি। এ সভ্যতায় মানুষের অবস্থান বস্তুরই বিকশিত রূপ মাত্র। বস্তু থেকে উদ্ভুত এককোষী প্রাণী থেকে বিকশিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত প্রাইমেট জাতীয় প্রাণীর (বানর, শিপাঞ্জী, বন মানুষ, ইত্যাদি) স্তর পার হয়ে মানুষের স্তরে উপনীত হয়েছে। মানুষ যদি এই হয়ে থাকে তাহলে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব বা তার কোন দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহীর প্রশ্ন অবান্তর। কাজেই লড়াই, দ্বন্দু সংঘাতই তো স্বাভাবিক। বিশেষ করে ডারউইনের “যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার” একবার মেনে নেওয়ার পর পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের নৈতিক ভিত্তিও প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। কমিউনিজমও ডারউইন তত্ত্বকেই গ্রহণ করেছে। কাজেই জড়বাদী সভ্যতায় দার্শনিকভাবে মানুষকে অত্যন্ত নিম্ন বিবেচনা করা হয়েছে। একটা যান্ত্রিক জীবে পরিণত করেছে। তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে জৈবিক জড়বাদীতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। এর ফলাফল দু’ রকমভাবে দেখা গেছে। কোথাও মানুষকে দায়িত্বহীন, স্বাতন্ত্রবাদী বিবেচনা করা হয়েছে- যার চরম রূপ নৈরাজ্যবাদ অন্যদিকে ইতর অযোগ্য বিবেচনা করেছে যার চরম রূপ বর্ণবাদ, একনায়কত্ব, ফ্যাসীবাদ ইত্যাদি। ইসলাম মানুষের সঠিক ও আদি পরিচয় তুলে ধরে তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন জানিয়ে দিয়েছে যে, মানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। ইসলামের মতে মানুষকে আল্লাহ তাআলা এক দায়িত্বশীল সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দিয়েছেন ইচ্ছা-শক্তি ও কর্মক্ষমতা এবং যাচাই-বিচারের অধিকার। পৃথিবীর বস্তু সম্পদের উপর তাকে দিয়েছেন অধিকার ও ক্ষমতা। কারণ মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হিসেবেই পৃথিবীর প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করা হয়। আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন:

وَ اِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیۡ جَاعِلٌ فِی الۡاَرۡضِ خَلِیۡفَةً

(সে সময়ের কথা কল্পনা করে দেখ) যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের . বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা পাঠাতে যাচ্ছি।” (সূরা বাকারা: ৩০)

শুধু ব্যক্তি আদমই খলীফা নন বরং গোটা মানবজাতিই পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা। আল-কুরআনের ঘোষণা:

هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَكُمۡ خَلٰٓئِفَ فِی الۡاَرۡضِ ؕ فَمَنۡ كَفَرَ فَعَلَیۡهِ كُفۡرُهٗ ؕ وَ لَا یَزِیۡدُ الۡكٰفِرِیۡنَ كُفۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ اِلَّا مَقۡتًا ۚ وَ لَا یَزِیۡدُ الۡكٰفِرِیۡنَ كُفۡرُهُمۡ اِلَّا خَسَارًا

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন। এখন যে কুফরী করবে তার কুফরী (পরিণাম) তারই উপর আপতিত হবে।" (সূরা ফাতিরঃ ৩৯)

কাজেই খলীফা করে মানবজাতিকে সৃষ্টি করা, তাকে জ্ঞান শিক্ষা দেয়া এবং ফেরেশতাদের দিয়ে আদমকে সিজদা করানো সবকিছুই আদম তথা মানবজাতির মর্যাদারই প্রমাণ। গোটা সৃষ্টি জগতেই মানুষ মর্যাদাশীল। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। কাজেই ইসলাম মানুষের সত্যিকার মর্যাদা দান করেছে। একদিকে মর্যাদা, অন্যদিক কর্তব্য। এটাই মানুষের সঠিক পরিচয়। মানুষ যদি তার এই পরিচয়, অবস্থান ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে তাহলে তার পক্ষে এ পৃথিবীতে সর্বোত্তম দায়িত্বশীলতা সম্ভব। হীনমন্যতা ও অহমিকার উভয় চরম মনোভাব তার পক্ষে পরিহার করা সম্ভব। তাই মহানবী (সা.)-এর আদর্শেই মানবজাতির যথার্থ আত্মপরিচয় নিহিত রয়েছে। এর ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুললে তাই হবে সর্বোত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ।

৩. ইসলাম হচ্ছে নির্ভেজাল ঐশী আদর্শঃ ইসলাম কোন মানব রচিত আদর্শ নয়। এ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন তার বাহক ও ব্যাখ্যাকারী। এর পূর্বে যে সমস্ত আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শ যুগে যুগে নবীগণ প্রচার করেন সেগুলো বেশীর ভাগই বিলুপ্ত। যা কিছু টিকে আছে তাও বিকৃত। কাজেই মহানবী (সা.) পেশকৃত আদর্শ ইসলাম হচ্ছে বর্তমানে একমাত্র নির্ভেজাল খোদা প্রদত্ত আদর্শ। পূর্ববর্তী সমস্ত ঐশী আদর্শের মৌল শিক্ষা সবই বর্তমানে ইসলামে নিহিত রয়েছে। মহানবী (সা.) আনীত গ্রন্থ আল-কুরআন ও তাঁর সুন্নাহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। তাই ইসলামের শিক্ষা জানার ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা বা সন্দেহের অবকাশ নেই। ইসলাম একটি জীবন্ত নির্ভেজাল ঐশী আদর্শ। কাজেই মানব রচিত আদর্শের যে সমস্ত দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় ইসলাম তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইসলাম সেই সত্ত্বা প্রদত্ত আদর্শ যিনি গোটা বিশ্বের এবং মানবজাতির প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তাই ইসলাম যে সর্ব বিচারে শ্রেষ্ঠ হবে তাতো সুস্পষ্ট।

৪. বৈষয়িক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সমন্বয়ঃ মানুষের জীবনের প্রধান দু'টি দিক রয়েছে। একটি তার বৈষয়িক জীবন অন্যটি আধ্যাত্মিক জীবন জড়বাদী সভ্যতা মানুষের বৈষয়িক উন্নতি সাধনকেই একান্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আধ্যাত্মিক জীবনকে হয় অস্বীকার করা হয়েছে না হয় বৈষয়িক জীবনের অনুষঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে মানুষের জীবনের বিকাশ হয়েছে একপেশে ও ভারসাম্যহীন। দৈহিক, বৈষয়িক অগ্রগতি হলেও মানবিক, আধ্যাত্মিক জীবন থেকে গেছে দুর্বল। ব্যক্তি জীবনতো বটেই সমাজেও এর প্রতিক্রিয়া শুভ হয়নি।

ইসলাম মানুষের জীবনের এ প্রধান দুটি দিককেই গুরুত্ব দিয়েছে। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। দেহ বাদ দিয়ে জীবন অসম্ভব আবার আত্মা বাদ দিয়ে জীবন অর্থহীন ও লক্ষ্যহীন। দেহ ও আত্মা নিয়েই জীবন। তাই ইসলাম দেহ ও আত্মা উভয়ের দাবীকে পূরণ করতে বলেছে। একদিকে ইবাদত-বন্দেগী-উপাসনা অন্যদিকে বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব ও ব্যবস্থা ইসলামের সমন্বিত রূপেরই বহিঃপ্রকাশ। ইসলাম যুগপৎ দুনিয়া ও পরকালেরই কল্যাণ সাধনের পক্ষপাতি। এজন্যই আল্লাহ নিজে মানুষকে দুনিয়া ও পরকাল উভয় জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেনঃ

وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ یَّقُوۡلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَةً وَّ فِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর, দান কর আখেরাতের কল্যাণও।" (সূরা বাকারা: ২০১)

বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন অস্বীকার করে বৈরাগ্য জীবন ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। এ মনোভাবটির নিন্দা করে পবিত্র কুরআন বলছে:

قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِیۡنَةَ اللّٰهِ الَّتِیۡۤ اَخۡرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّیِّبٰتِ مِنَ الرِّزۡقِ ؕ قُلۡ هِیَ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا خَالِصَةً یَّوۡمَ الۡقِیٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ

"বল, (হে নবী!) আল্লাহর সেসব সৌন্দর্য উপকরণকে কে হারাম ঘোষণা করেছে যা তিনি তার বান্দাদের জন্য উদ্ভব ঘটিয়েছেন এবং আল্লাহর দেয়া পবিত্র রিযিকসমূহ কে নিষিদ্ধ করেছে? বল, এ সমস্ত জিনিষ দুনিয়ায় ঈমানদারদের জন্যও।" (সূরা আরাফ: ৩২)

মহানবী (সা.) বলেছেন "ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই।" আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেন, "তোমরা নিজেদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করো না। তাহলে তোমাদেরকে কঠোরতায় নিক্ষেপ করা হবে। যে জাতি নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করেছে আল্লাহ তাদেরকেও কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন।" (আবু দাউদ: কিতাবুল আদাব)

কাজেই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মতো ইসলাম বৈষয়িক জীবনে কঠোরতার শিক্ষা দেয়নি। অন্যদিকে জড়বাদীদের মতো আত্মার দাবীকে পূরণের ব্যবস্থা নিয়েছে, উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। দেহ-আত্মা, বৈষয়িকতা, আধ্যাত্মিকতা, ইহকাল-পরকাল উভয়ের কল্যাণের কথা বলেছে।

৫. জীবনের সার্বিক দিকের মধ্যে ভারসাম্য: মানুষের জীবনের বহুবিধ বিভাগ ও তাদের সবারই চাহিদা রয়েছে। জড়বাদী সভ্যতার বিভিন্ন ব্যবস্থায় এককে চাহিদাকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, নিয়ামক মনে করা হয়েছে। ফ্রয়েডপন্থীরা মনে করে যৌনতাই হচ্ছে মানুষের আদি ও মূখ্য প্রয়োজন। আচরণ ও সমাজ সম্পর্ক নির্ধারণে যৌনবৃত্তি নিয়ামক। মার্ক্সবাদীরা মনে করে অর্থনীতিই হচ্ছে সবকিছুর মূল। সমাজ, তার কাঠামো, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সমাজের উন্নতি, অগ্রগতি সবই নির্ধারিত হয় অর্থনীতির ভিত্তিতেই। পুঁজিবাদীরা মনে করে ব্যক্তি উদ্যোগ ও ব্যক্তি হচ্ছে সব উন্নতির মূল। ফলে পশ্চিমা দুনিয়ায় ভারসাম্যহীন চিন্তা ও বিভিন্ন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। অবাধ যৌনতা, উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ, অর্থনীতি নির্ভর চরম চিন্তা, ভোগবাদ, নৈরাজ্য ইত্যাদি প্রবণতার বিচরণ ক্ষেত্র হচ্ছে আধুনিক বস্তু সভ্যতা। জীবন সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুস্থ চিন্তা এখানে অনুপস্থিত। একপেশে ও চরম প্রবণতাই এ সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মহানবীর আনীত আদর্শ জীবন ভারসাম্যতায় বিশ্বাসী। ইসলাম জীবনের প্রতিটি প্রবণতা ও চাহিদার যথোপযুক্ত গুরুত্ব এবং স্বীকৃতি দিয়েছে। যৌনতা, অর্থনীতি, ব্যক্তি স্বাধীনতা সবই এখানে স্বীকৃত। ইসলাম জীবনকে অখণ্ড বিবেচনা করে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ভারসাম্য ও সমন্বিত। এখানে সবার যুক্তিসঙ্গত দাবীই স্বীকৃত। বাড়াবাড়ি নয় পরিমিতিই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। কাজেই ইসলামের অধীনে মানুষের জীবন হবে ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত। সবার চাহিদা হবে পূরণ। কোন

প্রবণতা ও চাহিদাকেই এখানে অস্বীকার করা হবে না। উন্নতি-অগ্রগতির জন্য ভারসাম্য অতীব প্রয়োজন। তাই ইসলামের অধীনেই বিকাশ ও অগ্রগতি, উন্নতি যথার্থভাবে সম্ভব।

৬. বস্তুগত উন্নতি ও মানুষের কল্যাণে তা ব্যবহারের নিশ্চয়তা: দুনিয়ার অগ্রগতি-উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। ধর্মীয় আদর্শ সম্পর্কে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, পৃথিবীর সবকিছুকে ধর্ম নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ইতিবাচক। এমনকি ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, পৃথিবীর সবকিছুই মানবজাতির জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআনের ভাষায়:

“একমাত্র তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন।” (সুরা বাকারা: ১৯)

কাজেই যে পৃথিবীর সবকিছু মানবজাতির জন্য সে পৃথিবীতে উন্নতি-অগ্রগতির প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে অবশ্যই তার জন্য সৃষ্ট পৃথিবীর উপকরণাদি ভোগ-ব্যবহার করতে হবে। পৃথিবীতে নিহিত আল্লাহর অনুগ্রহ (ফযল) খুঁজে বের করতে হবে। তাকে যথার্থ কাজে লাগাতে হবে। যেহেতু সবকিছু মানুষের জন্য তাই কোন কিছুই মানবতার বিরুদ্ধে, তাদের অকল্যাণ হয় এমনভাবে ব্যবহার করা যাবে না। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সবকিছুকে মানুষের কল্যাণেই ব্যবহার করতে হবে। বস্তুগত উন্নতির এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে ইসলাম একথা বলে যে, পৃথিবীর সবকিছু এবং আকাশ রাজ্যের অনেক কিছু মানুষের জন্যই সৃষ্টি। কাজেই ইসলামই পারে বর্তমান প্রযুক্তিগত উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং এ সবের ফলাফলকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করতে।

৭. মানবীয় ভ্রাতৃত্ব: বর্তমান পৃথিবীর যুদ্ধ, হানাহানি, বর্ণবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি পরিহার করে মানবীয় ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন এমন একটি দর্শন ও ব্যবস্থা যা মানবজাতির ঐক্যের পথকে করবে প্রশস্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানবজাতি একজন নারী-পুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কুরআনের ভাষায়:

“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পরবর্তীতে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি-গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে পরস্পর পরিচিতি লাভ করতে পারো।” (সুরা হুজুরাত: ৪৯)

কাজেই মানবজাতি একই পিতা-মাতার সন্তান- একথা জানিয়ে দিয়ে সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যবধানের উর্ধ্বে ঐক্যের এক বিশাল সম্ভাবনার আশ্বাস-বাণী শুনিয়েছে। তদুপরি শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সমস্ত প্রাকৃতিক মানদণ্ডকে পরিহার করে পূণ্যময়তাকে (যা অর্জিত গুণ) গ্রহণ করার মাধ্যমে মানবীয় সাম্য গড়ে উঠার সুযোগ করে দিয়েছে। সমস্ত বর্ণবাদী ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে ইসলাম মানব ঐক্যের সীমাহীন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তাছাড়া ইসলাম এমন এক আহবান পেশ করেছে যা যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছে করলেই গ্রহণ করতে পারে এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর মুসলমানদেরকে আল-কুরআন এক দেহ সদৃশ ভাই ভাই বলে ঘোষণা করেছে। যারা মুমিন নয় তাদের ব্যাপারেও কোন নির্যাতনের অবকাশ রাখেনি ইসলাম। এ ক্ষেত্রে ইসলাম স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে,

"দ্বীনের মধ্যে (গ্রহণের ব্যাপারে) কোন জবরদস্তি নেই।" (সূরা বাকারা: ২৫৬)

কাজেই কোন ব্যক্তি ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ গ্রহণ না করলেও ইসলামের কল্যাণ প্রবাহ থেকে বঞ্চিত হবে না। নিজ মতবাদ ও ধর্মের উপর বহাল থেকেও ইসলামের কল্যাণকারীতা থেকে উপকৃত হতে পারে। বস্তুতঃ ইসলাম মানব ঐক্যের ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের এক অনুপম ফর্মুলা পেশ করেছে, যা সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত, সবার গ্রহণযোগ্য।

৮. পূর্ণাঙ্গতা: বর্তমান পৃথিবীতে জড়বাদ সংশ্লিষ্ট আদর্শগুলো এক পেশে ও অপূর্ণাঙ্গ। বস্তুগত দিকটি এখানে প্রাধান্য পেলেও অন্যান্য অনেক দিকই গৌণ বিবেচিত হয়েছে বা উপেক্ষিত হয়ে আছে। জীবনের সব দিকের গুরুত্ব মেনে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন ব্যবস্থা ইসলাম ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। ইসলাম একটি অনুপম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে একটি সুষ্ঠ অর্থনীতি যা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা দেয়, অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এতে রয়েছে এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যাতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে প্রতিটি মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সুনিশ্চিত হয়। যেখানে থাকে না কোন স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম-নির্যাতন, একনায়কত্ব ও বংশের ইজারাদারী, থাকে না মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব। সবাই সম-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলতে পারে এক সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র; যা শুধু কল্যাণ ও উন্নতিই বয়ে আনতে পারে মাটির পৃথিবীতে। ইসলামে রয়েছে এমন এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন যেখানে মানুষের সর্বাধিক বৃত্তির বিকাশ সম্ভব। সর্বপ্রকার ধৃষ্ঠতামুক্ত কল্যাণধর্মী, মানবতা কেন্দ্রিক এক অনাবিল প্রশান্ত, জীবন্ত সাংস্কৃতিক জীবন ধারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় ইসলাম এ পৃথিবীতে।

৯. ইসলাম মানব প্রকৃতি (বা ফিতরাত) নির্ভর আদর্শ: ইসলাম এমন একটি আদর্শ যা মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সর্বোতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে মানব প্রকৃতি বিরোধী কোন কিছুর স্থান নেই। মানব প্রকৃতির যা চাহিদা ইসলামে তাই রয়েছে। গোটা সৃষ্টি জগতে আল্লাহর বিধান (যাকে আমরা প্রকৃতির নিয়ম বলে থাকি) কার্যকর, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সবাই তা মানতে বাধ্য। এমনকি মানুষের জন্যও যে সমস্ত জীব তাত্ত্বিক-দৈহিক ইত্যাদি নিয়ম নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাও মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হয়। মূলতঃ মানুষের স্বাধীন কর্মক্ষেত্র ও কার্যক্রমকে সুচারু ও যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। স্বভাব ও মানব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থাই যথাযথ ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। কাজেই ইসলাম মেনে চলা মানেই স্বভাব প্রকৃতির উপর চলা। তাই আল-কুরআনের আহবান:

"অতএব একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্য এ দ্বীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির উপর, যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির (কাঠামোতে) মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হচ্ছে সর্বোতভাবে নির্ভুল সত্য দ্বীন বা জীবন বিধান।" (সুরা রূম: ৩৩):

বস্তুতঃ প্রকৃতি নির্ভর জীবন বিধানই নির্ভুল জীবন বিধান আর তা হচ্ছে আল ইসলাম। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ সভ্যতা নির্মাণ করতে হলে ইসলামকেই মেনে নিতে হবে। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য মতাদর্শ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানব প্রকৃতি বিরোধী।

১০. সার্বজনীনতা ও গতিশীলতাঃ ইসলাম এমন একটি আদর্শ যা সার্বজনীন। সমগ্র মানবজাতির জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেনঃ

"(হে নবী!) তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি।" (সুরা সাবাঃ ২৮)

তিনি ছিলেন সকলের জন্যই প্রেরিত নবী। আল-কুরআনের ভাষায়ঃ

"বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত নবী।" (সুরা আম্বিয়াঃ ১০৭)

কাজেই যে কোন যুগে যে কোন দেশে যে কোন জাতির জন্য মহানবীর আদর্শ প্রযোজ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে কোন স্তরে ইসলাম প্রয়োগযোগ্য। ইসলাম মানুষ ও তার সমাজের সার্বজনীন প্রকৃতি নির্ভর আদর্শ। ইসলাম ছাড়া সমস্ত আদর্শই বিশেষ যুগ বা প্রযুক্তির বিশেষ মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ইসলাম এমন কতিপয় মৌল ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে, এমন কতগুলো মৌল নীতিমালা পেশ করেছে যা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সবার জন্যই গ্রহণযোগ্য। ইসলামে মৌল নীতিমালা সার্বজনীন এবং অপরিবর্তনীয়। ফলে ইসলামী আদর্শ স্থিতিশীল আদর্শও বটে। আবার সার্বজনীনতা ও স্থিতিশীলতার পাশাপাশি রয়েছে গতিশীলতাও। ইসলাম মানব জীবন ও মানব সমাজের গতিশীলতা ও বিকাশে বিশ্বাসী। তাই সার্বজনীন আদর্শ হিসেবে তার মধ্যে অবশ্যই গতিশীলতা থাকতে হবে। গতিশীলতার অনিবার্য প্রয়োজনেই মূল উৎস ও মৌল নীতিমালার আলোকে যে কোন যুগের বিরাজমান সমস্যা সমাধানে ইসলামের রয়েছে ইজতিহাদ তথা জ্ঞান গবেষণার বিশাল সুযোগ যা তার মধ্যে এনে দিয়েছে এক অপরিসীম গতিশীলতা, মূলোৎপাটন করেছে যাবতীয় স্থবিরতা, জড়তা এবং সংকীর্ণতা। বস্তুতঃ ইসলাম মানব সমাজের সার্বজনীন শাশ্বত দিক এবং আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল দিক উভয়ের মধ্যে সর্বোত্তম সমন্বয় সাধন করেছে। তাই যুগপৎ সার্বজনীনতা, গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতা ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ইসলামই হতে পারে বর্তমান বিশ্বে একমাত্র আদর্শিক বিকল্প

বর্তমান জড়বাদী সভ্যতা ও তা থেকে সৃষ্টি বিভিন্ন সংকট ও সমস্যার কারণ সমূহ এবং পাশাপাশি ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলী পর্যালোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আজকের পৃথিবী, আজকের সমাজ ও সভ্যতা যে ধরণের সংকটের সম্মুখীন তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যে ধরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদর্শ প্রয়োজন মহানবী (সা.)-এর আনীত আদর্শই তা পূরণ করতে পারে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মীয় আর্দশও এমন নেই যা কাম্য সভ্যতার সবকটি শর্ত যথার্থভাবে পূরণ করতে পারে। ইসলাম ছাড়া যে প্রধান কয়টি ধর্ম রয়েছে যেমন- খ্রীষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইয়াহুদী ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম সেগুলো বিস্তারিত পর্যালোচনা করলে (যার অবকাশ এখানে নেই) একথা প্রমাণ হবে যে, বর্তমান সংকট ও সমস্যা দুর করে একটি বিকল্প

কল্যাণধর্মী মানবীয় সমাজ-সভ্যতা নির্মাণের সার্বিক সম্ভাব্যতা এগুলোর মধ্যে নেই। ধর্মীয় আদর্শগুলো বাদ দিলে যা থাকে সেগুলো জড়বাদী সভ্যতারই অঙ্গ, তারই বিভিন্ন প্রকরণ-যেগুলোর মাধ্যমে জড়বাদী সভ্যতা সৃষ্ট সংকট দূর করা সম্ভব নয়। ফলে একমাত্র বিকল্প থাকে ইসলাম। ইসলাম তাওহীদ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম আধ্যাত্মিকতার ধারক, ইসলামের মাধ্যমে বস্তুগত ও প্রযুক্তির বর্তমান উন্নয়নের ধারা তরান্বিত এবং মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে। ইসলামই মানুষের জীবনের সার্বিক সমস্যার ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানে সক্ষম, ইসলামই বিশ্বজনীন মানবীয় ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারে।

অর্থাৎ ইসলাম বর্তমান জড়বাদী সমাজ-সভ্যতা সৃষ্ট সংকট দূর করে তাওহীদ ভিত্তিক মানবীয় ভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টি করে প্রগতিশীল, কল্যাণধর্মী, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেয়। তাই আজ মহানবী (সা.)-এর আদর্শের ভিত্তিতে নতুন সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। এটিই আজকের ইতিহাসের অনিবার্য দাবী- মানবীয়তার গভীর আকুতি।

সমাপ্ত